৮.৩ নারীবাদ কাকে বলে? (What is Feminism?)

'নারীবাদ' কাকে বলে এ বিষয়ে সংক্ষেপে স্পষ্ট করে কিছু বলা সহজ নয়। নারীবাদের ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ কাজ নয়। 'নারীবাদী' ও 'অ-নারীবাদী' নির্বিশেষে এরকম অনেক মানুষ আছেন যাঁদের কাছে 'নারীবাদ' কথাটি খুব বেশী অর্থবহ নয়। 'নারীবাদ' ও 'নারীবাদী' কথাগুলি স্বতঃপ্রমাণিত। এ কথাগুলি স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ বিষয়ে বৌদ্ধিক আলোচনার এমন কোন প্রয়োজন নেই। এরকম একটা ধারণা অনেকের মধ্যে বর্তমান। কিন্তু সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

অন্যান্য মতবাদের মতই নারীবাদের তাত্ত্বিক বা ধারণাগত ভিত্তি কোন একক মতাদর্শগত কাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। এই কারণে সর্বকালে ও সকল মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নারীদের এমন কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়নি। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুদৃঢ় বাস্তব এবং সচেতনতা, ধ্যান-ধারণা ও ক্রিয়াকর্মের মানের উপর নারীবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে নারীবাদের সংজ্ঞার পরিবর্তন হতে পারে এবং হয়। মনে করা হয় যে সপ্তদশ শতাব্দীতেই 'নারীবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়। তখন নারীবাদের যে অর্থ ছিল, এই একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নিশ্চয়ই আর তা নেই। আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, এমনকি একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মহিলাদের 'নারীবাদ' কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই ধারণাগত পার্থক্যের কারণ হিসাবে শ্রেণীগত পটভূমি, শিক্ষার মান, সচেতনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্থক্যের কথা বলা হয়। আবার একই ধরনের মহিলাদের মধ্যেও নারীবাদী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা ও বিতর্ক বর্তমান। বিশেষত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুরুষ-প্রাধান্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি; নারী-পুরুষ, জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীগত বৈষম্যযুক্ত ও শোষণহীন সমাজের জন্য মহিলাদের সংগ্রামের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়েও মতানৈক্য বর্তমান।

মতপার্থক্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও নারীবাদের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কমলা ভাসিন ও নিঘত সইদ খান (Kamala Bhasin and Nighat Said Khan) তাঁদের *Feminism* শীর্ষক এক পুস্তিকায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নারীবাদ হল সমাজে, কর্মক্ষেত্রে ও পরিবারের মধ্যে মহিলাদের উপর শোষণ-পীড়ন সম্পর্কে সচেতনতা এবং এই অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নারী ও পুরুষের সচেতন উদ্যোগ-আয়োজন। কমলা ভাসিন ও নিঘাত সইদ খান বলেছেন: "(Feminism is) an awareness of women's oppression and exploitation in society, at work and within the family, and conscious action by women and men to change this situation." উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী যে ব্যক্তি নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য-বৈষম্য, পিতৃতন্ত্র ও পুরুষ-প্রাধান্যের অস্তিত্বকে অনুধাবন করে এবং এর বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাকেই নারীবাদী বলা যায়। অর্থাৎ একজন নারীবাদী লিঙ্গগত বৈষম্য চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষজাতির প্রাধান্যমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় হবেন। একজন নারীবাদী নানাভাবে নারীনির্যাতন ও পুরুষের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে পারেন।

আগেকার দিনে নারীবাদীদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য মহিলাদের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত অধিকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: শিক্ষার অধিকার, ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চাকরির অধিকার, আইনসভায় নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, পরিবার পরিকল্পনার অধিকার প্রভৃতি। অর্থাৎ সমাজে মহিলাদের আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আইনমূলক সংস্কার সাধনের কর্মসূচীর মধ্যে নারীবাদীদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিককালে নারীবাদীদের কর্মসূচীর পরিধি আইনগত সংস্কার সাধনের সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। নারীবাদীরা নারীমুক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী। সাম্প্রতিককালে নারীবাদী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি হল গৃহের মধ্যে নারীর অধীনতামূলক অবস্থানের অবসান, পরিবারের মধ্যে নারীর উপর শোষণ-পীড়নের অবসান; সমাজ-সংস্কৃতি ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদমিত অবস্থানের অবস্থান প্রভৃতি। কমলা ভাসিন ও নিঘাত সইদ খান বলেছেন: "...feminism challenges the very notions of feminity and masculinity as mutually exclusive, biologically determined categories." সকল রকমের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীবাদে রাষ্ট্র সমাজ ও পুরুষদের দ্বারা সৃষ্টি সকল রকম শোষণ-পীড়ন থেকে নারীজাতির স্বাধীনতা বা মুক্তির কথা বলা হয়। আধুনিককালে নারীবাদের মূল কথা হল গৃহের ভিতরে ও বাইরে

Scanned by CamScanner

নারীজাতির জন্য সাম্য, স্বাধীনতা, মর্যাদা সুনিশ্চিত করার জন্য সফল আন্দোলন সংগঠিত করা। ভাসিন ও খান এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "In its essence then, present-day feminsm is a struggle for the achievement of women's equality, dignity and freedom of choice to control our lives and bodies within and outside the home."

সাধারণভাবে বলা যায় যে, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা ধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে নারীবাদী ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে 'পিতৃতন্ত্র' বলতে সাবেকি বৃহৎ পরিবারে পিতা বা পিতৃপ্রতিম পুরুষের সর্বময় কর্তৃত্বের ব্যবস্থাকে বোঝান হয় না। এ ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্র বলতে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব কায়েম রাখার সামাজিক ব্যবস্থাকেই বোঝান হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিকতা বলতে হতভাগ্য নারীদের উপর পাষণ্ড পুরুষদের পীড়নমূলক আচরণকেও বোঝান হয় না। নারীবাদী চিন্তাবিদ্‌দের কাছে পিতৃতন্ত্র হল একটি ধারণা বিশেষ। পিতৃতন্ত্র হল নারী ও পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক এক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত থাকে পুরুষজাতির এক ধরনের প্রতীকী ক্ষমতা। এই ক্ষমতার সুবাদে নারীজাতির উপর পুরুষজাতির সামগ্রিক কর্তৃত্ব কায়েম থাকে। ব্যক্তি-পুরুষের স্বেচ্ছাচার পিতৃতন্ত্র নয়। পিতৃতন্ত্রের একটি প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা বর্তমান। আর্থনীতিক, সামাজিক-সংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনীতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীজাতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে কমলা ভাসীন সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। ঘরের এবং ঘরের বাইরের কাজকর্মের ক্ষেত্রে মহিলাদের উৎপাদন-ক্ষমতা পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। মহিলাদের গৃহকর্ম সামাজিক উৎপাদনের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয় না। ঘরের বাইরে কাজের ব্যাপারে মহিলারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। ব্যক্তি-পুরুষের হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের প্রতিকূলতাও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। নারীত্ব-মাতৃত্বের যুগ্ম আদর্শের মূল হল নারীর প্রজনন ক্ষমতা। পুরুষ, রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্মিলিত প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ নারীর প্রজনন প্রক্রিয়ার উপর পরিলক্ষিত হয়। নারীর যৌনতার অধিকারও পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত। পুরুষের যৌনতৃপ্তির উপায় হিসাবেই নারীর যৌনতা স্বীকৃত।

অর্থনীতিতে পুরুষের আধিপত্য অনস্বীকার্য। সম্পত্তির ভাগ ও ভোগের ক্ষেত্রেও পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। আইনী ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রেও পুরুষের দাপট দেখা যায়। রাজনীতির জগতেও পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।

নারীবাদীরা নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক আলোচনার জন্য 'পিতৃতন্ত্র' কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। হেউড (Andrew Heywood) তাঁর *Political Ideologies* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Feminists use the concept of 'patriarchy' to describe the power relationship between men and women." সাবেকি রাজনীতিক তত্ত্ব নারীজাতির উপর পুরুষের অত্যাচারের বিষয়টিকে বরাবরই অগ্রাহ্য করে এসেছে। ঐতিহ্যগত রাজনীতিক মতবাদসমূহে লিঙ্গগত ভেদাভেদের বিষয়টির রাজনীতিক তাৎপর্যকে কখনই স্বীকার করা হয়নি। এই অবস্থায় নারীবাদীরা নতুন ধারণা ও মতবাদ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছেন। নারীবাদীদের উদ্দেশ্য হল নতুন মতাদর্শের মাধ্যমে এই বক্তব্য তুলে ধরা যে, লিঙ্গগত অসাম্য-বৈষম্য ও পীড়নমূলক ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ধারণার ভিত্তিতে নারীবাদীরা 'লিঙ্গগত রাজনীতি'(sexual politics)-র তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। এ ক্ষেত্রে তুলনীয় বিষয় হিসাবে 'শ্রেণীগত রাজনীতি' (Class politics)-র ধারণা স্মরণীয়। জাতিগত ভেদাভেদ ও জাতিগত পীড়নের মতই, নারীবাদে লিঙ্গগত ভেদাভেদ ও লিঙ্গগত পীড়নের কথা বলা হয়। নারীবাদীদের কাছে সামাজিক শ্রেণী, জাতি ও ধর্মের মতই লিঙ্গও হল সামাজিক সংঘাতের তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বিশেষ। র‍্যাডিক্যাল (radical) নারীবাদীদের মতানুসারে লিঙ্গ হল অত্যন্ত গভীর এবং রাজনীতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিভাজন। হেউড মন্তব্য করেছেন: "Feminist believe that gender, like social class, race or religion, is a significant social cleavage. Indeed, radical feminists argue that gender is the deepest and most politically important of social divisions." নারীবাদীদের অভিমত অনুযায়ী 'পুরুষের কর্তৃত্ব এবং মহিলাদের আনুগত্য ও অধীনতা'— এই হল নারী-পুরুষের ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রকৃতি। পরিবারিক জীবনের ক্ষমতা-কাঠামোর ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বৃহত্তর সমাজের ক্ষমতা-কাঠামোর ক্ষেত্রেও এই একই ধারা প্রবাহিত। অ্যান্ড্রু হেউড মন্তব্য করেছেন: "Patriarchy thus expresses the belief that the pattern of male domination and female subordination that characterizes society at large is, essentially, a reflection of the power structures that operate within domestic life."

Scanned by CamScanner

অনেক নারীবাদীর মতানুসারে নারীবাদের মূল কথা হল যে, লিঙ্গগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নারীজাতি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। মহিলাদের এমন অনেক প্রয়োজন আছে যা পুরণ করা হয় না। মহিলাদের অনেক চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। নারীজাতির এই সমস্ত প্রয়োজনের পরিতৃপ্তির জন্য আবশ্যক হল এক মৌলিক আমূল পরিবর্তন সাধন। অনেকের মতানুসারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আবশ্যক। রোজালিন্ড, ডেলমার (Rosalind Delmar) তাঁর *What is Feminism?* শীর্ষক এক রচনায় বলেছেন: "...at the very least a feminist is someone who holds that women suffer discrimination because of their sex, that they have specific needs which remain neglected and unsatisfied and that the satisfaction of these needs would require a radical change (some would say a revolution even) in the social, economic and political order."

ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক এক রচনায় 'নারীবাদ' ও তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপিকা ব্রাইসনের অভিমত অনুযায়ী সকল নারীবাদী ধারণার সাধারণ সূত্রপাত হিসাবে একটি বিশেষ বিশ্বাসের কথা বলা হয়। এই বিশ্বাসটি হল যে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অসুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থিত। নারীজাতির এই অসুবিধাজনক অবস্থার পিছনে জৈবিক পার্থক্যজনিত কোন অপরিহার্য বা স্বাভাবিক কারণ নেই। এর পিছনে যে কারণ বর্তমান তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ এবং পরিবর্তন প্রয়োজন। ব্রাইসন বলেছেন: "A common starting–point for all femeinist ideas is the belief that women are disadvantaged in comparison with men, and that this disadvantage is not a natural and inevitable result of biological difference but something that can and should be challenged and changed."

নারীবাদ এই দুনিয়াকে দেখার এক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রাজনীতিক বিষয় হিসাবে নারীজাতির অবস্থা-অবস্থান এবং নারী-পুরুষের মধ্যে অসাম্য-বৈষম্যের উপর জোর দেওয়া হয়। এদিক থেকে বিচার করলে রাজনীতির প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র সম্পর্কে বিদ্যমান ও প্রাধান্যমূলক ধ্যান-ধারণার প্রতি নারীবাদ হল একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সুতরাং প্রচলিত ও প্রাধান্যমূলক রাজনীতিক মতবাদ ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে নারীবাদ সামঞ্জস্য-রহিত। ব্রাইসন বলেছেন: "Unlike traditional political theories and ideologies, feminism provides a way of looking at the world that sees women's situation and the inequalities between men and women as central political issues, as such, it provides a fundamental challenge to dominant assumptions about the scope and nature of politics."

আধুনিক নারীবাদীদের অভিমত অনুযায়ী রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপ কেবলমাত্র সরকার বা সরকারী সংস্থাসমূহ সম্পর্কিত বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সকল সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনীতিক ক্রিয়াকর্ম সংঘটিত হয়। যখন এবং যেখানেই সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তখন এবং সেখানেই রাজনীতির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। নারীবাদীদের যুক্তি অনুযায়ী লিঙ্গগত অসাম্য-বৈষম্য অব্যাহতভাবে বর্তমান। কারণ সমাজে লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন অব্যাহত। এই লিঙ্গগত শ্রমবিভাজনকে রাজনীতিক নয়, স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী জিন. বি. এলশটেইন (Jean B. Elshtain) তাঁর *Public Man, Private Women* (1981) শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। প্রথাগতভাবে রাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি, ঘরের বাইরের সর্বসাধারণের কাজকর্ম প্রভৃতি পুরুষদের একচেটিয়া বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। অপরদিকে পারিবারিক ও ঘর-গৃহস্থলীর দায়-দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যেই মহিলাদের পরিধি সীমাবদ্ধ। গৃহবধূ ও জননীরা ব্যক্তিগত ভূমিকার মধ্যে মহিলাদের বন্দী রেখে, রাজনীতি থেকে তাদের তফাতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজনীতিকে যদি সরকারী ক্ষেত্রসমূহের বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তা হলে মহিলাদের ভূমিকা ও লিঙ্গগত অসাম্য-বৈষম্যের কোন রকম রাজনীতিক গুরুত্ব থাকে না। নারীবাদীরা নারী-পুরুষের মধ্যে এই 'পাবলিক-প্রাইভেট' (public-private) ভেদাভেদমূলক ধারণার বিরোধিতা করেছেন।

র‍্যাডিক্যাল (radical) নারীবাদীদের অভিমত অনুযায়ী রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপ ঘরের সদর দরজায় গিয়ে থেমে যায় না। ব্যক্তিগত বিষয়াদিও রাজনীতিক প্রকৃতি পায়। জনজীবনের সকল ক্ষেত্রেই নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে এবং বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে পরিবারের মধ্যেই এর সূত্রপাত ঘটে। এই কারণে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা প্রাত্যহিক জীবনের রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী। ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্ম ও আনুষঙ্গিক দায়-দায়িত্বের বণ্টন, লিঙ্গগত ও ব্যক্তিগত আচরণের রাজনীতি, পরিবার পরিচালনার প্রক্রিয়া প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত।

Scanned by CamScanner

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর (প্রতিটি প্রশ্নের মান-১০)

প্রঃ ভারতে নারী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss about women's movement in India]

উঃ বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারী আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা যেমন চলছে, তেমনি এবিষয়ে সচেতনতা এবং লেখালিখি বহুল পরিমাণে বাড়ছে। নারীরা নিজেদের এমন একটা জায়গায় এমন একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছে যেখান থেকে নিজের সত্তাকে খুঁজে নিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে এবং প্রয়োজনে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ১৯১৭ সালের ৪ঠা মার্চ মাসে রাশিয়ায় শ্রমিক নারীরা জার-এর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সভা ও মিছিল করে। ১৯৫০ এর ৮ই মার্চ জার্মানির ৩ লক্ষ নারী Chancellas কে Post card পাঠিয়ে শান্তির দাবিকরে। ১৯৭৯ সালের ৮ই মার্চ বোর্খার বিরুদ্ধে ৫০ হাজার ইরাণী মেয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নারী অধীনতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ভারতবর্ষের নারী সংগঠনগুলিও প্রতিবছর ৮ই মার্চ তারা বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সভা সমাবেশ মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি করে থাকে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় নারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরের দু-দশকে তা একেবারেই নিম্নমুখী হয়ে পড়ে।

শ্রীমতি বন্দনা চ্যাটার্জী তাঁর 'women and politics in India' প্রবন্ধে স্বাধীনতা লাভের পরের দু-দশকে ভারতীয় নারীদের রাজনীতিতে পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে একধরণের বিশ্বাসকে দায়ী করেছেন। এই সময় ভারতীয় মহিলারা এবং মহিলাদের দ্বারা গঠিত সংগঠনগুলি নেয়। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর অগাধ আস্থা রেখেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এই নতুন রাষ্ট্রটি নিজের থেকে প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন ঘটাবে এবং নারীকে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু বাস্তবে এবিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। কাজেই ভারতীয় নারীরা ১৯৭০-এর দশক থেকে পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।

এই সময় নারী আন্দোলনগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিলপ্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘনের ঘটনাকে ন্যূনতম করা। ১৯৭০ এর দশকে এই নারী জাগরণের পিছনে কতগুলি উপাদান কাজ করেছে, যেমন-

১) এই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ডাক।

২) ১৯৭৪ সালের Railway Strike.

৩) জরুরি অবস্থার সময় নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।

Scanned by CamScanner

৪) ভারতীয় নারীর অবসান সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদনে নারীর অসম ও অবহেলিত অবস্থান সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ।

৫) মথুরা ধর্ষন মামলা ইত্যাদি।

এইসব ঘটনা ভারতের ম্যধবিত্ত সম্প্রদায়ের ও শ্রমিক শ্রেণীভূক্ত নারীদের ভীষণভাবে সক্রিয় করে তোলে। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন নারী সম্মেলনের আয়জন করে। মহারাষ্ট্রে স্বামীদের মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান এবং স্ত্রী প্রহারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে ছোট ছোট মহিলা শিবির গড়ে তোলা হয়। তবে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে নারী আন্দোলনের পন্থা ও পদ্ধতি সামিল করে দিত মূলত পুরুষরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি।

ভারতীয় নারী আন্দোলনে নারীদের নিজস্বতা ও স্বাধীনতা বাড়তে থাকে ১৯৮০'র দশক থেকে। এই সময় ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বিপুলভাবে বেড়ে যায়। সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য ছোট-বড়-মঝারি নারী সংগঠন গড়ে ওঠে। যারা কিনা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং চাকুরি, মজুরি ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যায়।

এই সময় ভারতে নারী আন্দোলনের মূলত তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—

১) উদারপন্থি ধারা। ২) বামপন্থি ধারা। ৩) Radical ধারা।

১) উদারপন্থিরা আইনি সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোগ করেন। বামপন্থি নারীবাদীরা লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানে সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেন। আর Radical Feminist রা নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতার সম্পর্কের পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেন। এই সময় বিশ্বের নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা ভারতের নারীবাদী আন্দোলনগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করে। যেমন— আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন এবং UNO-র উদ্যোগে Maxico, Copenhegen, নাইরুবি এবং বেজিং শহরে অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনগুলির কথা বলা যায়।

ভারতবর্ষে নারীসংগঠনগুলির প্রতি বছর ৮ই মার্চ তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে সভা সমাবেশ মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি করে থাকে।

মূল্যায়ন : সমালোচকরা ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের কতগুলি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন। যথা—

১) স্বাধীনতার আগে নারী সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় নারীদের মধ্যে তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায়নি।

২) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের নারী আন্দোলনগুলি স্তিমিত এবং রাজনৈতিক নেতা নির্ভর হয়ে পড়ে।

৩) ভারতের নারী আন্দোলনের প্রধান দূর্বলতা হল এই আন্দোলন মূলত শহরে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

Scanned by CamScanner

৪) জাত-পাত, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, কু-প্রথা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারার অভাব ইত্যাদি ভারতের নারীবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করেছে।

৫) ভারতের বেশিরভাগ নারীবাদী সংগঠন হয় কোন রাজনৈতিক দলের শাখা হিসেবে কাজ করেছে অথবা কোন কোন দলের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে কাজ করেছে। ফলে এইসব সংগঠন নারী আন্দোলনে স্বাধীন ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়ে।

এই সমালোচনা কাটিয়ে উঠতে গেলে যেটি সবচেয়ে বেশি দরকার সেটি হল ভারতের নারীবাদী সংগঠনগুলিকে তথা নারীবাদী আন্দোলনের নেতাদেরকে আরও বেশি স্বাধীন ভূমিকা পালনে আগ্রহী হতে হবে।

প্রঃ 'লিঙ্গ-বৈষম্য ও রাজনীতি' এই বিষয়ে আলোকপাত করো।

[Discuss about Gender Inequality and Politics]

।।অথবা।। লিঙ্গবৈষম্য কী? নারী কিভাবে লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয় তার ব্যাখ্যা।

উঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন পার্থক্যের বিষয়টি সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিদ্যমান। দৈহিক গঠনগত পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। দৈহিক শক্তি প্রয়োগের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে, তাই যে সমস্ত কাজে শক্তি প্রয়োগের বেশি প্রয়োজন, সেখানে পুরুষেরই প্রাধান্যকারী। আবার সন্তান লালন-পালন ও গৃহকর্মে মেয়েদের বেশি সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। এই জৈবিক পার্থক্য ছাড়াও নারী ও পুরুষের মধ্যে মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্যকে বলা হয় লিঙ্গ পার্থক্য বা Gendered difeneecs বা 'লিঙ্গ বৈষম্য' বা 'Gender Thegnality'। এই পার্থক্যটি স্থায়ী বা চিরন্তন নয়। কারণ, আদিম সাম্যবাদী সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে এই ধরণের কোনও পার্থক্য ছিল না। এটা শুরু হয়েছে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবের সময়থেকে। এই লিঙ্গ পার্থক্য নারী-পুরুষের সম্পর্কের আমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

এঙ্গেলস বলেন– পুরুষের কাছে নারীর বশ্যতা ও অধীনতার প্রাথমিক কারণ হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা শ্রমবিভাজন ও শ্রেণির সৃষ্টি। ভোগেল বলেন– যখন থেকে শ্রেণী বিভক্ত, শ্রমবিভাজিত সমাজ ধীরে ধীরে মূল উৎপাদন থেকে একদল নারীকে সরিয়ে দিল শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন ও পালনে এবং গৃহশ্রমে, তখন থেকেই নারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। নারী পুরুষের এই অবস্থানগত বিভাজন তারা চূড়ান্ত রূপ নিল আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। জঃ বুলা ভদ্রের মতে– আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কর্ম ও গৃহকর্ম তক্ Office ও Home সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। এর থেকেই নারীত্ব ও পৌরষে যথাক্রমে নারী ও পুরুষের দুটি পৃথক সামাজিক সত্ত্ব ও মতাদর্শ হয়ে উঠল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই নারীত্বই নারীকে সর্বক্ষণ শোষণ পীড়নের নাগপাশে বেঁধে রাখে। এর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে নারীত্বের ভ্রান্ত ধারণা, যা ভালো মেয়ে, ভালো বৌ, ভালো মা হতে শেখায়।

Scanned by CamScanner

আধুনিক গবেষকদের মতে নারীত্ব ও পৌরষে এদুটি সামাজিক সত্তা জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয় না। এক ধরণের সামাজিক প্রক্রিয়ায় তারা অর্জন করে নারীত্ব বা পৌরষে। শিক্ষার ওপর সামাজিকীকরনের প্রক্রিয়া শুরু হয় জন্মলগ্ন থেকেই। শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব নেয় মা ও বাবা এবং আত্মীয়স্বজন। মেয়েকে ক্রিকেট মাঠে পাঠানো হচ্ছে, আর ছেলেকে নাচের স্কুলে ভর্তি করানো হচ্ছে এধরণের ঘটনা প্রায় বিরল। এইভাবে চলতে থাকে লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিকীকরণ যার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কোন নারী বা পুরষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণ থেকে জাত ভিত্তিক অসাম্য-এর ফলে একদিকে শ্রেণী হিসাবে মহিলারা নিরবচ্ছিন্ন অবহেলা, উপেক্ষা ও বৈষম্যমূলক সামাজিক আচরণের শিকার হয় এবং অন্যদিকে পুরুষেরা যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। ফলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীদের দ্বৈত শোষনের শিকার হতে হয়। একদিকে শোষিত জনগণের অংশ হিসাবে শাসক শ্রেণীর হাতে শোষিত হতে হয় এবং অন্যদিকে পরিবারের পুরুষে কর্তার অধিপত্যের কাছে অত্মসমর্পণ করতে হয়।

শিল্প ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু হওয়ার আগে পরিবারের স্ত্রী-পুরুষে নির্বিশেষে সকলকেই কৃষি বা হস্তশিল্পের কাজে অংশগ্রণ করতে হত। ফলে নারীরা একপ্রকার সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত। কিন্তু পরে শিল্পীভিত্তিক ব্যবস্থা চালু হলে উৎপাদনের মূল কেন্দ্র গৃহ থেকে কারখানায় চলে আসে। ফলে পুরুষেরা কারখানাতে আর নারীরা গৃহে নিযুক্ত হল ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীরা পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। নারী তার উপার্জনকারী সত্ত্বাকে হারিয়ে মূলত সন্তান পালনের যন্ত্রে পরিণত হল। বর্তমানে অফিস-আদালতে কর্মে নিযুক্ত মহিলারা ও লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। নির্মলা ব্যানার্জী, মালবিকা ফার্লেকার প্রমুখরা তাদের লেখাতে দেখিয়েছেন যে, ভারতেও মহিলা কর্মিদের পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বেতন ও নিম্নমানের কাজে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতের এই গুরুত্বের সামাজিক সমস্যাটিকে অমর্ত্য সেন একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন। তিনি লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়টির বিশ্লেষণ বিভিন্ন দেশ ও সমাজের লিঙ্গ ভিত্তিক অনুপাত এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেন একটি দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল যে দেশের জনসংখ্যায় নারী পুরুষের অনুপাত। কোনও দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি যদি মহিলা হয় তাহলে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত। আর যদি উল্টোটা হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই দেশে বা সমাজে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি মাত্রায় বৈষম্যমূলক আচরণ, বঞ্চনা, অবহেলা ও নিপীড়নের শিকার। বর্তমানে ভারতে প্রতি ১০০০ জন পুরুষ পিছু নারীর সংখ্য ৯৩০ জন। এই একটি মাত্র সূচক থেকেই বোঝাযায় ভারতীয় নারীরা কী দারুনভাবে অপুষ্টি, অশিক্ষা ও অবহেলার শিকার।

Scanned by CamScanner

ডঃ সেনের মতে– নারীদের প্রতি আপেক্ষিক অবহেলার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হল দেশের নারীদের নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রবণতা। জানা যায় ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকাতে প্রায় ১০০ মিলিয়ান নারী নিরুদ্দেশ হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র ভারতে এই নিরুদ্দেশ নারীর সংখ্যাটি হল প্রায় ৪০ মিলিয়ন। তার মতে এর পিছনে কাজ করে জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি অবহেলার মধ্যে।

লিঙ্গ-বৈষম্য হ্রাসের উপায় : অনেকের মতে কোনও সমাজে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই যেখানে নারীরা অবহেলিত অবস্থার উত্তরন ঘটবে। **ডঃ অমর্ত্য সেনের** মতে– এই ধারণা সবক্ষেত্রে, সব সময় ঠিক না তিনি বলেন পাঞ্জাব ও হরিয়ানার অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেশের শীর্ষে থাকলেও এদুটি রাজ্যের জন্মহার আজও গড় ভারতীয় হারের চেয়ে বেশি এবং নারীদের বিরুদ্ধে লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতের অনেক লক্ষনই এখানে বিদ্যমান।

আসলে এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান খুঁজতে হলে, অমর্ত্য সেনের মতে– সমস্যার একেবারে তৃণমূল স্তরে, অর্থাৎ পারিবারিক স্তর থেকেই যদি নারী প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে এবং পাশাপাশি যদি কর্তৃত্বের অঙ্কুররটিকেও জাগ্রত করতে পারে, তাহলে এই বৈষম্যের জগদ্দল পাথরটি ধীরে ধীরে সরে যাবে। পারিবারিক স্তরে এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটলে বৃহত্তর অর্থে সামাজিক স্তরে তার সম্প্রসারণ ঘটতে বাধ্য। তবে নারীকে এই অধিকার অর্জন করতে হলে, তার প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ারটি হবে সাক্ষরতা ও শিক্ষা। সেন খুব জোর দিয়ে বলেছেন– নারী সাক্ষরতা ও শিক্ষা ছাড়া লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের নিরসন সম্ভব নয়। এছাড়া তিনি যে বিষয়টির ওপর জোর দেন তা হল কার্যকরী কর্মস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জনে নারীর সক্ষমতা। আর এই সক্ষমতা অর্জন করতে হবে নারীর নিজ অধিকারে, কারোর দয়ার মাধ্যমে নয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও কর্মই আনতে পারে কার্যকরি স্বাধীনতা, যা নারীকে নারী নয়, মানুষ হিসাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

Scanned by CamScanner